"বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব"

জনৈক ছাত্র

চতুর্থ বর্ষ—সাহিত্য বিভাগ।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একদা আক্ষেপপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, লোক সুন্দর, তবু মনে হয় এ বুঝি নিজের নহে ধার করা জিনিষ। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের অনুসন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্য কবি ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য রচনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের যে ধারা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী যাহা কিছু পুরাতন ও দেশীয় তাহাকেই ঘৃণা করিতে শিখিল। তখন তাহাদের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য যাহা সৃষ্ট হয় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রতিই কটাক্ষপাত করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। সেই জন্য বাঙ্গালীর কাব্যের জাতীয় ধারা কি তাহা বিচার করিবার জন্য তিনি গুপ্ত কবির উল্লেখ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলার কবি-হৃদয়ের আদি ও অকৃত্রিম উৎস আবিষ্কার করিতে হইলে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে তাহার একটী বিষয় সর্ব্বাগ্রে আমাদের গোচরীভূত হয়। প্রেম ও ধর্ম্ম—এই দুইটী ভাব বাঙ্গালীকে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা যোগাইয়াছে; তাই বাংলা সাহিত্য শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে হইবে এবং মূলটী সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রাচীন বাংলা ও পাশ্চাত্যভাব-গঠিত বাংলা সাহিত্য এই দুইটী বিপরীতধর্ম্মী স্রোতের মোহনায় দাঁড়াইয়া ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজের কাব্যেও এই দুইটী বিপরীতধর্ম্মী স্রোতের মিলন সাধিত করিয়াছিলেন এবং বহু লেখককেও দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে এক বিষয়ে প্রাচীন বাংলার শেষ কবি ও আধুনিক বাংলার প্রথম কবি বলা যাইতে পারে—তিনি যেন একটী সেতু।

সৃষ্টির প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা লইয়া ঈশ্বরগুপ্ত কাব্য রচনা আরম্ভ করেন; বাংলার জল, মাটি, আকাশ-বাতাস ও বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা—ইহাই ছিল তাঁহার কাব্যরচনার উপাদান। তিনি মনে প্রাণে ছিলেন বাঙ্গালী, তাঁহার কাব্যে 'কেলাকা ফুল' নাই। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, তাহাদের ঘরের কথা এরূপ সহানুভূতির সহিত কেহই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সুর বাঙ্গালীর নিজস্ব; এইখানের কবিওয়ালাদিগের সহিত ঈশ্বরগুপ্তের যোগ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর রসবোধে রুচির একটু পার্থক্য আসিয়াছিল; ঈশ্বরগুপ্ত ইহা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার কাব্যে কবিওয়ালাদিগের ন্যায় কুরুচি প্রবল হইতে পারে নাই। এখানে তাঁহাকে আধুনিক বলা যায়। বাঙ্গালী জীবনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যরচনার মূল প্রেরণা। যেখানে তিনি কৃত্রিমতা লক্ষ্য করিয়াছেন সেখানে তিনি কি ভীষণ তীব্র হইয়াছেন। ব্যঙ্গের খরধার অস্ত্র চালনা করিয়া হৃত আদর্শের প্রতি গতি ফিরাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ঈশ্বরগুপ্তের অনেক কবিতা চাল ও রুচির বিচারে বাতিল হইয়া যাইবে। অনেক হয়তো বলিবেন—ঈশ্বরগুপ্ত কবি ছিলেন না। তিনি সাহিত্যের এক জন 'ভাঁড়' বিশেষ। কিন্তু তিনি এক সময়ে বাঙ্গালীর দুঃখ-সুখকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া, প্রাচীন কবিদিগের এক জন হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কালে তাঁহার নাম ভুলিয়া যাইবার উপায় নাই।

প্রাচীন বাঙ্গালী কবিওয়ালারা বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখকে বড় করিয়া কাব্য রচনা করেন। আধুনিক রুচির মাপকাঠিতে বিচার করিতে বসিয়া অনেকেই কবিওয়ালাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই কবিওয়ালারা দেশের অশিক্ষিত, কৃষক, চাষী প্রভৃতির অবসর বিনোদনের নিমিত্ত কাব্য রচনা করিত; শ্রোতাদের বিদ্যাবুদ্ধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া স্থূলতম অনুভূতি প্রকাশ না করিলে তাহাদের মনোরঞ্জন করা কঠিন হইত। তাই রুচির দিক দিয়াও ইহাদের মুখ একটু ঝালগা না রাখিলে শ্রোতার মন সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। রাজসভায় রাজকীয় আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া শিক্ষিত ও সংস্কৃত শ্রোতাদিগের জন্য রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে রুচির পরিচয় দিয়াছিলেন, কবিওয়ালারা তাহার বেশী কিছু করেন নাই।

বৈষ্ণব কবিগণ সংস্কৃত রস-শাস্ত্রকে ঢালিয়া সাজিয়া সংক্ষিপ্ত করেন। বাৎসল্য ও মধুর এই দুইটী রসকে আশ্রয় করিয়া কবিওয়ালারা তাহাদের কাব্য আরম্ভ করে। বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল ধর্ম্ম প্রচার; তাই মধুর রসকে যথাসম্ভব সংযত, গম্ভীর ও আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কবিওয়ালাদিগের এমন কোন সাধু উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা শ্রোতার চিত্তবিনোদনের জন্য হাল্কা, চপল সুর আনিয়াছিলেন; মধুর রসের মধ্যে কামনা, ছলনা ও বঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা রস-কলহের একটী সরস আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাৎসল্য রসকে আশ্রয় করিয়া কবিদিগের আগমনী গান রচনা ইহাই বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রকৃত মনের ব্যথা প্রকাশ করিতেছে। তাই ইহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য নাই; ব্যথার ভাবে ইহার রস লঘুত্ব শুকাইয়া গিয়াছে। তাই আগমনী গানের এত আদর।

বাংলার ঘরে ঘরে যখন শারদীয় পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিল, বাঙ্গালীর মা দেখিলেন তাঁহার ঘর অন্ধকার; মেয়ে শ্বশুরালয় হইতে আসে নাই। মনের বেদনা মনের মধ্যে

চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইল—চোখের জলে মনের ব্যথা' প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালী মায়ের সন্তান বাঙ্গালী কবি মায়ের প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন—সেই ব্যথার সুরে গান বাঁধিয়া বাঙ্গালী কবি মায়ের প্রাণের ব্যথা বুঝাইলেন। মায়ের দুঃখ তাঁহারা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাদের দ্বারা অঙ্কিত বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবনের চিত্রটী এত সজীব ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। বাঙালীর সমাজ এবং জীবন-যাত্রার অনেক সংস্কার হইয়াছে বটে কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। শারদীয় উৎসব পূর্ব্বের মতই বাদ্য বাজাইয়া বাঙালীর ঘরে আসিতেছে, মায়ের গৃহ সেইরূপ শূন্য এবং তাঁহার চোখের জলও সেইরূপ ঝরিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী সন্তানের আজ আর ঘরের দিকে দৃষ্টি নাই। তাই আজ সেই বাঙ্গালী কবিদের মনে পড়িতেছে যাহারা 'মায়ের সন্তান হইয়া বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মায়ের দুঃখের দেওয়ালী সাজাইয়া ছিলেন ; তাই বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দিনে মনে পড়ে সেই খাঁটী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরগুপ্তের কথা! বর্ত্তমান বাংলায় তাঁহার ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিকের একান্ত প্রয়োজন। অন্যায় ও অসামঞ্জস্য—এই দুইটীর বিরুদ্ধে 'অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম' বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে তাহার হৃত আদর্শের প্রতি গতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হায়, ঈশ্বরগুপ্ত কোথায়!!

'কনিকা'র প্রতি

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ হাজরা
প্রথম বর্ষ—বিজ্ঞান।

শুধাংশু ডাকিয়া কহে, তারকার রাশে,
'জোনাকীর দ্যুতি নিয়া জ্বলিস্ আকাশে।'
তারা কহে, 'আমাদের তবু আছে আলো,
'রবির করুণা বিনা তব মুখ কালো।'